PRINT

সমকাল

তিনজনের ডিগ্রি প্রত্যাহার হোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১১ ঘণ্টা আগে

ড. সাখাওয়াৎ আনসারী

খাজা নাজিমুদ্দিন

ইস্কান্দার মির্জা

আইয়ুব খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। তিন বছরের মধ্যেই শতায়ুর গৌরব স্পর্শ করতে যাওয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এ যাবৎ আয়োজন করেছে ৫০টি সমাবর্তনের। আসন্ন সমাবর্তন হবে এর ৫১নতম আয়োজন। প্রতিটি সমাবর্তনেই বিশ্ববিদ্যালয় এক অথবা একাধিক ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে এসেছে। যাদের ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে, ধরেই নিতে হবে যে, তারা রাষ্ট্র ও সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু ডিগ্রিপ্রাপ্তদের কারও কারও এ সম্মানপ্রাপ্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এমনই তিনজন হলেন- খাজা নাজিমুদ্দিন, ইস্কান্দার মির্জা এবং আইয়ুব খান। এদের মধ্যে খাজা নাজিমুদ্দিনকে ১৯৪৯ সালের, ইস্কান্দার মির্জাকে

১৯৫৬ সালের এবং আইয়ুব খানকে ১৯৬০ সালের সমাবর্তনে ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

প্রথমেই খাজা নাজিমুদ্দিন প্রসঙ্গ। ভাষা আন্দোলনের '৪৮ এবং '৫২-র দুই পর্বেই তার ভূমিকা ছিল বাংলাবিরোধী, বাঙালিবিরোধী। ঢাকায় জন্ম হওয়া সত্ত্বেও এই বঙ্গসন্তান বাংলা বলতে পারতেন না। তার পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু। হয়তোবা এ জন্যই তিনি কখনোই বাংলাকে বুকে ধারণও করতে পারেননি। '৪৭-এর ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটলে তিনি তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। এই পদবি বহমান ছিল '৪৮-এর ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হলে তিনি ১৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন এবং এ দায়িত্ব পালন করেন ১৯৫১ সালের ১৭ এপ্রিল থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে '৪৮-এর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সারা পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ওই দিন ধর্মঘটে বহু ছাত্র-জনতা আহত হন; গ্রেফতার করা হয় মোট ৬৯ জনকে। এর পরিণাম হয় ভয়াবহ। সারা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের পূর্ণ সমর্থনে আন্দোলনে প্রবল গতি সঞ্চারিত হয়। ১৩-১৫ মার্চ ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে তা প্রশমনে নাজিমুদ্দিন উদ্যোগী হন। ১৫ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে তিনি আট দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। আট দফার মধ্যে ছিল গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দেওয়া, তদন্ত কমিটি গঠন করা, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করা, ব্যবস্থাপক সভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়টি উত্থাপন করা ইত্যাদি। ৩০ মার্চ বসে আইনসভার বাজেট অধিবেশন। চুক্তি অনুসারে নাজিমুদ্দিন বাংলাকে পূর্ববাংলার সরকারি ভাষা, আদালতের ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব পেশ করেন। আইনসভার সদস্যরা কর্তৃক সমর্থনের পর তা গৃহীতও হয়। কিন্তু বাংলাকে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার যে প্রস্তাব চুক্তির দ্বিতীয় দফায় ছিল, তা তিনি উত্থাপনই করেননি। সংগ্রাম পরিষদ এ ব্যাপারে তার কাছে কৈফিয়ত দাবি করলে তিনি বলেছিলেন, 'কায়েদে আজম, যাকে জাতির পিতা বলা হয়। বলে গিয়েছেন যে, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে, অতএব আমি যদি এ প্রস্তাব পেশ করি, তাহলে কায়েদে আজমের প্রতি অসম্মান দেখানো হবে। সুতরাং চুক্তির এ ধারা পালনে আমি অক্ষম' (আবুল কাশেম, 'প্রবন্ধ মঞ্জুষা', ঢাকা :স্ববিকাশ পাবলিশার্স, ১৯৮৯, পৃ. ৯৮)। এভাবেই তিনি চুক্তি ভঙ্গ করে জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকদের তালিকায় নিজের নাম লেখান।

১৯৪৮ সালে চুক্তিভঙ্গের পর আবার '৫২-তেও তিনি একটি ভাষণে এমন একটি ন্যক্কারজনক উক্তি করেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়ে দাবানল। ২৭ জানুয়ারিতে পল্টন ময়দানের এক জনসভায় তিনি ঘোষণা দেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। বাংলা হরফে উর্দু লেখা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। '৪৮-এ তিনি দোহাই দিয়েছিলেন জিন্নাহর, এবার তিনি নিজেই আবির্ভূত হলেন জিন্নাহর ভূমিকায়। এ যেন জিন্নাহরই প্রেতাত্মা, যা ভর করেছিল তার ওপর। ৩ ফেব্রুয়ারিতে গভর্নমেন্ট হাউসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনেও তার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একই সুর- 'আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হতে চলেছে, অন্য কোনো ভাষা নয়' (দৈনিক আজাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। এভাবেই বাঙালির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করে গেছেন তিনি বারবার।

'৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের মানুষকে একটি সংবিধান পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে সাড়ে আট বছরেরও বেশি সময়। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান বলবৎ হয় ২৩ মার্চ ১৯৫৬ সালে। সামরিক জান্তা ইস্কান্দার মির্জা তখন গভর্নর জেনারেল। সাম্প্রদায়িক চরিত্রের এই সংবিধানের বিধান অনুসারে দেশ পরিণত হয় একটি ইসলামী

প্রজাতন্ত্রে। সংবিধান প্রবর্তন দিবসে ইস্কান্দার দেশটির প্রথম রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন। তার গভর্নর জেনারেলশিপের সময়ে বহু প্রতীক্ষিত সংবিধান প্রবর্তিত হলেও তিনি এমনই এক ব্যক্তি, যিনি কখনোই চাননি যে, সংবিধান কার্যকর থাকুক। তার আচরণ ছিল অগণতান্ত্রিক, সংবিধানবিরোধী এবং স্বার্থানুকূল। তারই পরিণতিতে সংবিধান বলবৎ হওয়া মাত্র আড়াই বছরের মাথায় '৫৮ সালের ৭ অক্টোবর তিনি সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন। সংবিধান বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও যেসব হীনকর্ম করেন, সেগুলো হলো : ১. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে বরখাস্ত করা; ২. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদকে ভেঙে দেওয়া; ৩. সব রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা এবং ৪. সামরিক আইন জারি করা। অবিভক্ত পাকিস্তানের সামরিক শাসনের সূচনাকারী ইস্কান্দার মির্জা কুখ্যাত হিসেবে ইতিহাসে চির অক্ষয় হয়ে থাকবেন। অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম তিনজন রাষ্ট্রপতিই সামরিক শাসক। হয়তোবা এই ইস্কান্দারের প্রদর্শিত পথেই স্বাধীন বাংলাদেশে দু' দুবার সামরিক শাসনের আগমন। তিনি সংবিধান বাতিল করলেও সংবিধান তাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সংবিধান বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো ক্ষমতা দেয়নি। তিনি সংবিধান হত্যাকারী এবং সেই সঙ্গে প্রথম গণতন্ত্র হত্যাকারী।

প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমতালিপ্সু আইয়ুব খান রাষ্ট্রের শীর্ষ পদটি দখল করেন ২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে সেনাশাসনের বিরুদ্ধে সেনা ক্যু ঘটিয়ে। এটিও নজিরবিহীন যে, তিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন সেনাপ্রধানের পদে থেকেই। ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা সামরিক আইন জারি করে আইয়ুব খানকে সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করায় বাহিনীটি আইয়ুবের অধীন ও অনুগত ছিল আগে থেকেই। সুযোগ নিয়ে মাত্র ২০ দিনের মাথায় তিনি ইস্কান্দারকে সরিয়ে দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আরেক অন্যায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। এভাবেই সূচিত হয় আইয়ুবি সেনা ও স্বৈরশাসন দশ বছর ধরে। ক্ষমতা দখলের এক বছরের মাথায় আইয়ুব 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে এক অদ্ভুত পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, যার মাধ্যমে মন্ত্রিসভা ও প্রতিনিধি পরিষদগুলো সর্বতোভাবে তার তল্পিবাহক এবং প্রাদেশিক বা অন্য যে কোনো স্তরেরই স্বায়ত্তশাসন বিনষ্ট হয়ে পড়ে। আইয়ুবের ঘৃণ্য কর্ম-খতিয়ান দীর্ঘ। এখানে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করছি- ১. তিনিই প্রথম বিডি মেম্বারদের মাধ্যমে হ্যাঁ-না পদ্ধতির প্রয়োগে অপর কোনো রাষ্ট্রপতি পদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছাড়াই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ব্যালটে সিল মারারও সেখানে কোনো বিধান ছিল না; ২. তারই কারণে অন্য কোনো দলবিহীন পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ একক দল হিসেবে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়; ৩. তার আমলে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও হয়রানি নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়ে পড়ে; ৪. নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে তিনি একটি উদ্ভট সংবিধান, যা 'আইয়ুবের সংবিধান' নামে পরিচিত, প্রবর্তন করেন। এ সংবিধানের মাধ্যমে সব ক্ষমতা তিনি তার হাতে কুক্ষিগত করেন; ৫. ছাত্র আন্দোলন দমনে তিনিই প্রথম 'এনএসএফ' নামের পেটোয়া বাহিনী তৈরি করেন; ৬. ছাত্রদের কাছে অগ্রহণযোগ্য ১৯৬২ সালের শরীফ শিক্ষা কমিশন সুপারিশ তারই ইন্ধনে প্রবর্তিত হয়। এর বিরোধিতার পরিণতিতেই প্রতি বছর উদযাপিত হয় ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস হিসেবে; ৭. আইয়ুব খানের একান্ত বশংবদ মোনায়েম খান এবং ড. ওসমান গনি যথাক্রমে গভর্নর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। এই দু'জনের নিয়োগের ফলে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর চরম দমন-পীড়ন শুরু হয়; ৮. আইয়ুবের দাম্ভিকতার পরিণতিতে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং পরাজিত হয়। যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত থাকে; দ্রব্যমূল্যে মানুষের নাভিশ্বাস অবস্থার সৃষ্টি হয়; ৯. প্রতিহিংসা চরিতার্থকল্পে ১৯৬৮ সালে আইয়ুব বঙ্গবন্ধুসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ এনে মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করেন।

ওপরে খাজা নাজিমুদ্দিন, ইস্কান্দার মির্জা এবং আইয়ুব খানের কীর্তিকলাপের নানা ফিরিস্তি সংক্ষেপে উপস্থাপন

করলাম। যে সালে নাজিমুদ্দিনকে ডিগ্রি দেওয়া হয়েছিল, সেই '৪৯ সালেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল ভাষাসৈনিক আবদুল মতিনকে। সেই মতিনকেই আবার বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৮ সালে সমাবর্তন বক্তার এবং ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদানের সম্মান দেয়। মতিন ও নাজিমুদ্দিনের নাম কি একই তালিকায় মানায়? বঙ্গবন্ধুর বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তার ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দিতে পারলে কুখ্যাত এই তিনজনের ডিগ্রি কেন প্রত্যাহার করা যাবে না? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি তার কৃতিত্বের সুনাম ক্ষুণ্ন করতে না চায়, তাহলে তার উচিত হবে এই তিনজনকে ডিগ্রি প্রদানের কলঙ্কতিলক মুছে ফেলা। আমাদের দাবিও তেমনই।

অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

© সমকাল 2005 - 2018

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com